১)অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি বেছে লেখ। (১X৪=৪)

পৃথিবীর উত্তর সীমায় উত্তর মেরু আর দক্ষিন সীমায় দক্ষিন মেরু। মেরুতে সর্বদাই অত্যন্ত শীত। সমস্ত বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ জুড়িয়া কেবল বরফ জমিয়া আছে। একসঙ্গে দুমাস হয়ত সূর্যের আলোর দেখাই পাওয়া গেল না। যখন সূর্য দেখা গেল তখন সূর্যের আলো বড়ই ক্ষীণ। উত্তাপ বড়ই মৃদু। সীল, পেঙ্গুইন প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণী ছাড়া সেখানে এত শীতে আর কোন জীবজন্তু বাস করিতে পারে না। গাছপালা প্রভৃতি কোনও উদ্ভিদ সেখানে জন্মিতে পারে না। মেরুতে প্রায়ই ঝড় হয় – তাহাকে তুষার ঝটিকা বলে। সে অতি ভীষণ ব্যাপার। তীব্রভাবে বাতাস বইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত হইতে থাকে। এই ঝড়ের মুখে পড়িলে আর রক্ষা নেই। শীতের বাতাসে, তুষারের স্পর্শে হাত পা অসাড় হইয়া যায়, দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া হৃৎপিন্ডের স্পন্দন থামিয়া যায়।

ক্যাপ্টেন স্কট নামে একজন সাহসী ইংরেজ দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। মেরুর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া ফিরিবার পথে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯০০ খ্রী: দক্ষিণ মেরু সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ মেরুতে একদল লোক পাঠানো হইবে

স্থির করা হইল। ক্যাপ্টেন স্কট তখন নৌবিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। তাঁহাকে এই অভিযানের দলপতি নিযুক্ত করা হহিল। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি সদলবলে জাহাজে চড়িয়া দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণ মেরু হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংল্যান্ডে আসিলেন। সে বার মেরুর প্রান্ত ৫০০ মাইলও ব্যবধান ছিল না। তাঁহার পূর্বে কেহই আর এতদূর যাইতে পারে নাই। মেরুভ্রমন করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি যাহা বলিলেন , তাহাতে লোকে আরো আনেক নতুন তথ্য জানিতে পারিল। পূর্বে লোকের ধারনা ছিল যে, দক্ষিণ মেরুও উত্তর মেরুর ন্যায় একটি মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু স্কট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, দক্ষিণ মেরুর দিকে একটি প্রকান্ড মহাদেশ রহিয়াছে। সেই প্রকান্ড মহাদেশের উপর দশ পনেরো হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়েরর শ্রেণি পর পর চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বরফের নদী বহিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে চির তুষারে আবৃত উপত্যকা। পর্বতশৃঙ্গ, নদী, উপত্যকা সমস্তই বরফে আচ্ছন্ন। এই পথে চলিতে চলিতে তিনি অনেকবার অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন। একবার এক পাহাড়ের উপর হইতে স্কট দুইজন সঙ্গী লইয়া বরফের নদী দিয়া নীচে নামিতেছিলেন তাঁহাদের তিনজনের কোমরে শক্ত দড়ি ছিল। দড়ির অপর প্রান্ত একখানা শ্লেজের সঙ্গে বাঁধা ছিল। স্কট ও তাহার একজন সঙ্গী একটি আগে আগে চলিতেছিলেন। চলিতে চলিতে হঠাৎ একটি ফাঁটলের মধ্যে তাঁহারা পড়িয়া গেলেন। ফাঁটলের মুখ বরফে ঢাকা ছিল বলিয়া তাঁহারা পূর্বে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। দড়িতে টান পড়িতেই পিছনের শ্লেজখানি ফাঁটলের মুখে আসিয়া আটকাইয়া গেল। তখন দড়ি বাহিয়া তাঁহারা অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

।) মেরু সম্বন্ধে পূর্বে লোকের কী ধারণা ছীল?

ক) মেরুতে কোন জনপ্রাণির বাস নেই

খ) দক্ষিণ মেরুও উত্তর মেরুর ন্যায় একটি মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত।

গ) দক্ষিণ মেরুতে অনেক পর্বতশৃঙ্গ আছে

ঘ) দক্ষিণ মেরুতে অনেক বরফের নদী প্রবাহিত।

II) মেরু অঞ্চলে কোন প্রাণী বাস করে?

ক) সীল, পেঙ্গুইন

খ) জলহস্তি, কুমীর

গ) জলজ প্রাণী

ঘ) বন্যপ্রাণী

III) ক্যাপ্টেন স্কট একবার দক্ষিণ মেরুর পথে চলিতে গিয়া চরম বিপদে পড়িয়াছিলেন।

কারণ বরফের নদী দিয়া নীচে নামিতে নামিতে হঠাৎ এক ফাটলের মুখে পড়িয়া যান।

ক) মন্তব্য ও কারণ দুটোই ঠিক।

খ) মন্তব্য ঠিক , কারণ ভুল

গ) কারণ ঠিক, মন্তব্য ভুল

ঘ) কারণ ও মন্তব্য দুটোই ভুল

IV) বাক্যপরিবর্তন কর:

মেরু অঞ্চলে অত্যধিক ঠান্ডায় রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া হৃৎপিন্ডের স্পন্দন থামিয়া যায়।

(যৌগিক)

২)অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি বেছে লেখ। (১X৪=৪)

ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎসভায় শোনাতে হবে ; ভারতের শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহন না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না । শুধু তাই নয় , বিজ্ঞান, সাহিত্য , কলা , শিল্প ব্যবসা , বানিজ্য – এসব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু দেবে ও কিছু শেখাবে। তাই ভারতের মণষীগন কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের সন্ততি আমরা, আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না করে কি মরতে পারি?

মনুষ্য দেহ পঞ্চভূতে মিশলেও জীবাত্মা কখন মরে না। তদ্রুপ মৃত্যুমুখে পতিত হলেও জাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার ধারাই তার আত্মা : জাতির সৃষ্টিশক্তি যখন বিলুপ্ত হয় তখন বুঝতে হবে যে জাতি মরতে বসেছে। আহার, নিদ্রা ও সন্তানোৎপাদন তখন তার কার্যতালিকা হয়ে দাঁড়ায় এবং গতানুগতিক পথ অনুসরণ করাই হবে তার একমাত্র নীতি। এ অবস্থায় পরেও কোন কোন জাতি আবার বেঁচে ওঠে, যদি তার অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে। অন্ধকারময় যুগ যখন জাতিকে এসে গ্রাস করে , তখন সে কোন প্রকারে নিজের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার ধারা বাঁচিয়ে রাখে , অন্য জাতির সঙ্গে মিশে যায় না। তারপর অদৃষ্ট বা ভগবানের ইঙ্গিতে আবার নব জাগরণ দেখা যায়। অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হয়। প্রসুপ্ত জাতি আবার চোখ খোলে, তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসে। সহস্রদল পদ্মের মতো জাতির প্রাণধর্ম আবার ফুটে ওঠে এবং নব নব রূপে , নব নব ভাবে ও নব নব দিকে আত্মপ্রকাশ লাভ

করে। এরূপ অনেক মৃত্যু ও জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি চলে এসেছে, কারণ ভারতের একটা mission আছে। ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে – যা আজও সফলা হয় নাই।

i) ভারতীয় জাতি মরেও পুনর্জীবন লাভ করেছে তার কারণ কী ?

ক) ভারতীয়রা অমর

খ) ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা আছে

গ) ভারতে অনেক মহাপুরুষ আছে

ঘ) ভারতের বেদান্ত আছে

ii) কখন বোঝা যায় জাতি মরতে বসেছে?

ক) যখন অন্ধকার যুগ জাতিকে গ্রাস করে

খ) শিক্ষা তার অর্থ হারায়

গ) জাতির সৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত হয়

ঘ) জাতির কর্মক্ষমতা কমে যায়

iii) অন্ধকারময় যুগ এসে গ্রাস করলে কীভাবে জাতি আবার আত্মপ্রকাশ লাভ করে?

ক) শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতার ধারা বাঁচিয়ে রেখে

খ) অন্য জাতির সাথে মিশে যায়

গ) গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করে

ঘ) সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে যায়

iv) বাক্য পরিবর্তন কর :

ভারতীয় সভ্যতার উদ্দশ্য আজও সফল হয় নাই। (জটিল)

৩)অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি বেছে লেখ। (১X৪=৪)

মুখোশের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আসলে আদিম মানুষ মুখে নানা রং দিয়ে আঁকিবুকি কেটে ছদ্মবেশে শিকারে বেরোত। তারপরে ক্রমশ সেই আঁকিবুকি শুরু হল মুখোশে। আফ্রিকা, চীন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সভ্যতা অনুসরণ করলেই বেরিয়ে পড়বে বিভিন্ন মুখোশ। সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মুখোশধারীকে দেখা যায় বলগা হরিণের মুখোশে,ফ্রান্সে ত্রোয়া ফ্রেরে গুহাচিত্রে। ১৫৩০ এর দশকে মধ্য ফরাসী শব্দ

মাস্ক থেকে আসে ইংরেজি মাস্কের প্রচলন। এই ফরাসী শব্দ আবার এসেছে ইটালীয় মাশচেরা থেকে। এটি আবার এসেছে মধ্যযুগের লাতিন শব্দ মাস্কা থেকে, যার অর্থ মুখোশ বা দুঃস্বপ্ন।

শিকার থেকে ক্রমশ মানুষের বিনোদনের মঞ্চে ঠাই পেয়েছে মুখোশ। ছৌ এর নাচে রামায়ণ , মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে তুলে ধরা হয়মহিষাসুরমর্দিনী পালাও। ছৌ এর মুখোশ মূলত তৈরি হয় মাটি ও কাগজ দিয়ে। পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রামের মুখোশ শিল্পী বিজয় সূত্রধর বললেন , প্রথমে মাটি দিয়ে মুখের গড়ন তৈরি করে নেওয়া হয় তারপরে কাঠের ক্ষার সুতির কাপড়ে ঝেড়ে ময়দা দিয়ে আঠা তৈরি করতে হয়। এবার ভালো মানের কাগজ, মাটি দিয়ে

তৈরি মুখের উপরে ওই আঠা দিয়ে সেটে দিতে হবে। এভাবে পাঁচ থেকে সাতটি স্তর তৈরি করতে হয়। এবার রোদে শুকিয়ে উপরে পলিমাটি দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। তারও পরে পড়বে কাবিশের প্রলেপ। এবার মুখোশটা সুতির কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সব শেষে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এবার মাটির ছাঁচ থেকে কাগজের অংশ তুলে নিলে বেরিয়ে আসবে মুখোশ। তারপর শুরু হবে রং। বিজয়ের দাবী, এই মুখোশ কাগজের হলেও,এত শক্ত হয় যে, তার উপরে মানুষ উঠে দাঁড়ালেও তা ভাঙে না। রং শুকিয়ে গেলে মুখোশের সাজপর্ব।কোন চরিত্রের মুখোশ সেই অনুযায়ী তৈরি হয় সাজ। দুর্গার মুখোশ যেমন জরি, চুমকি, কার্তিকের মুখোশ হলে আবার দরকার হয় ময়ূরের পালক। অন্য দিকে মালদা ও দিনাজপুরে দেখা যায় গম্ভীরা মুখোশ। কথ্য ভাষায় গমীরা। সে মুখোশের ব্যবহারও গম্ভীরা নাচে।

i) আদিম সময়ে মানুষ মুখে নানা রং দিয়েআঁকিবুকি কাটত কেন?

ক) সভ্য মানুষের ভয়ে

খ) ছদ্মবেশে শিকারে বেরোনোর জন্য

গ) পুলিশের নজর থেকে বাঁচার জন্য

ঘ) মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য

ii) পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মুখোশধারীকে কিসের ছদ্মবেশে দেখা যায়?

ক) বাঘের মুখোশে

খ)সিংহের মুখোশে

গ) হাতির মুখোশে

ঘ) বলগা হরিণের মুখোশে

iii) ছৌ এর মুখোশ মূলত কিসের দ্বারা তৈরি?

ক) রং ও মাটি দিয়ে

খ) সিমেন্ট দিয়ে

গ) মাটি ও কাগজ দিয়ে

ঘ) সুতির কাপড় দিয়ে

iv) ব্যবহার এর বিপরীত শব্দ কী?

ক) অপব্যবহার

খ) অব্যবহার

গ) অতিব্যবহার

ঘ) প্রতিব্যবহার